আমার কাল আমার চিন্তা
(হজ্জ্ব এবং উইটনেস পাইওনিয়ার)
শাহ আবদুল হান্নান

হজ্জ্ব পালন

১৯৯২ সালে আমি হজ্জ্বে যাই। ৩রা জুন রওনা হই এবং ২৪শে জুন ফিরে আসি। আমার নিজের এমন কোনো সামর্থ্য ছিল না যে নিজের খরচে হজ্জ্ব করি। সে সময় আমার তেমন কোনো সম্পদই ছিল না। রাবেতা আলমে আল ইসলামীর আমন্ত্রণে আমি হজ্জ্ব করি। রাবেতার পরিচালক মীর কাসেম আলী তাদের সদর দপ্তরে বিভিন্ন নামের সাথে আমারও নাম পাঠান। তাদের আমন্ত্রণের কারণেই আমার পক্ষে হজ্জ্বে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এখানে হজ্জ্বের গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে হজ্জ্বকে কেন আল্লাহ তায়ালা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ করলন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন লেখায় হজ্জ্বের অনেক কারণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি, আল্লাহতায়ালা ইসলামকে বিশ্ব ধর্ম হিসেবে যেহেতু মনোনীত করেছেন এবং তিনি জানেন এটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। হতে পারে একদিন বিশ্বের অধিকাংশের ধর্ম এটাই হবে। অর্থাৎ গোটা মানবজাতির হতে পারে। সেই জন্যে তিনি এমন একটা পদ্ধতি বা ইনিস্টিটিউশনের ব্যবস্থা করেছেন যার মাধ্যমে বিশ্ববাসী আবশ্যিকভাবে যোগাযোগ (Interact) করতে পারে। এর মধ্যে দিয়ে বাৎসরিক পারস্পরিক যোগাযোগের চিরন্তন ব্যবস্থা এবং ফরজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেটা অনাবশ্যিক বা অপশনাল নয়, বাধ্যতামূলক, তা তিনি করে দিয়েছেন। এর একটা উদ্দেশ্য এটাই যে, যেখান থেকে ইসলামের বাণী আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বে প্রচার করেন - অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) যে এলাকায় কাজ শুরু করেন তার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত করিয়ে দেয়া। গভীরভাবে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়া। এটাও একটা বড় উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। যে কাবাকে কেন্দ্র করে ইসলামের অগ্রগতি বা যাত্রা সেই কাবার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়াও একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এটাই বলে মনে হয় যে, ইসলাম মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের কি গুরুত্ব দেয়। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় হবে, বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী হবে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হবে। এখানে বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, বিভিন্ন বংশ ও জাতি রয়েছে এবং তারা সবাই ইসলামের অংশীদার হবে বা হয়েছে। তাদেরই পারস্পরিক যোগাযোগের প্রয়োজনকে আল্লাহতায়ালা তার পরিকল্পনার মধ্যে রেখেছিলেন এবং এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন বলেই আমার ধারণা মতে হজ্জ্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, হজ্জ্বের সে ব্যবহার হয়তো বা পুরোপুরি হচ্ছে না। আজ আনুষ্ঠানিকতা গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও প্রত্যেক দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা যে আরো ব্যাপক হতে পারত সেদিকে সে দেশের সরকারের নজর দেয়ার দরকার ছিল। আর নজর দিলে হজ্জ্বের গুরুত্ব বাড়বে। আবার এর মানে এই নয় যে, রাজনীতির চর্চা করতে হবে। মানবজীবনের একটা অংশ রাজনীতি। এর বাইরেও ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সহ নানা ধরনের চিন্তা মতামত রয়েছে। এসব কিছু আলোচনা বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো দ্বন্দ্বকে বৃদ্ধি না করে হতে পারে এবং হওয়া উচিত। যেটা এখন হচ্ছে না।

অতীতের দিকে যদি আমরা খেয়াল করি দেখব, ইসলামের শুরুর দিকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের সময় সকল এলাকার কিছু কিছু লোক আসত এবং তারা খোলামেলাভাবে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন রাজনৈতিক শক্তি খুব বাধা দিত বলে আমার জানা নেই। তখন সিটিজেনশিপ উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বের যে কোনো স্থানের লোক আসতে পারত। ব্যবসা-বাণিজ্যও সে তুলনায় ফ্রি ছিল। আজকের মতো ট্যারিফ নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার এত ছিল না। আমাদেরকে ভবিষ্যতে এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে বলে আমি মনে করি।

আমার হজ্জ্বের সফরসঙ্গী যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। একজন ছিলেন আমার মুরব্বী এবং সর্বদিক থেকে মান্যবর বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব জনাব ওবায়দুল হক সাহেব। আরেকজন ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও ছোট ভাই অত্যন্ত স্বনামধন্য ব্যক্তি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী। একজন ছিলেন মরহুম জাস্টিস

আবদুল রহমান সাহেব ও তার স্ত্রী। খতীব সাহেবের বড় ছেলে মাওলানা সউদও আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। আমরা দশজনের মতো একটা গ্রুপ ছিলাম।

জেদ্দা এয়ারপোর্টের কাস্টম ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়াকে আমার কাছে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হলো। আমাদের ফ্লাইটে আমরা খুব বেশি যাত্রী ছিলাম তেমনও নয় এবং চেকিং পয়েন্টেও তেমন ভীড় ছিল না। কিন্তু তারপরও আমাদের ক্লিয়ারেন্সে চার-পাঁচ ঘন্টা সময় লেগে যায়। তাদের ধীরগতির পরীক্ষা ও তার পদ্ধতি আমাকে অবাক করে দেয় যেটা অন্য কোনো কোনো দেশে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপর মাত্র। বিরানব্বই সালে আমাদের বেলায় এই ঘটেছে, অন্যদের ব্যাপারে কি ঘটে জানি না। তবে আশা করি বর্তমানে সে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করল রাবেতার এক ছেলে। অল্প বয়স। মনে হলো তার এক হাতে সমস্যা আছে। তাই সে এক হাতে কাজ করত। কিন্তু অত্যন্ত চটপটে ছেলে ছিল। সে আমাদেরকে গাড়ি করে হারাম শরীফের পাশ দিয়ে মিনায় রাবেতার এক রেস্ট হাউসে নিয়ে গেল। সেখানে শ'দুয়েক লোক থাকার ব্যবস্থা আছে বলে মনে হলো। সেখানে রুম এলটমেন্ট করতে প্রায় ঘন্টা দু'য়েক সময় পেরিয়ে গেল। আমরা মাগরিবের পরপর পৌঁছেছিলাম। এর আগে জেদ্দায় পৌঁছাই দুপুরের দিকে। জেদ্দা থেকে মিনার দুরত্ব ঘন্টা দেড়েকের। অথচ কাস্টমসে চার-পাঁচ ঘন্টা আর রুম এলোটমেন্টে দু'ঘন্টা অযথাই গেল। আমরা একই রুমে তের-চৌদ্দজন থাকতাম। আমার পাশের সিটেই ছিলেন সাঈদী সাহেব এবং ৭/৮ হাত দূরে থাকতেন খতীব সাহেব। এই রুমটার মধ্যেই আমরা ১৫/১৬ দিনের মতো ছিলাম। সবাই ছিলাম বাংলাদেশী। ফলে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অনেক গভীর হয়। বাহিরের কেবল একজন ইথিওপিয় মুসলিম ছিলেন সে রুমে।

তখনও ইথিওপিয়া থেকে ইরিত্রিয়া আলাদা হয়নি। ইথিওপিয়ার একজন হাজী ছিলেন। তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমার আরবি খুব সীমাবদ্ধ আর উনি আরবি ছাড়া কিছুই বলতে পারেন না। ইথিওপিয়ার মুসলিমরা প্রধানত আরবিতেই কথা বলে থাকে। তবে তাদের লোকাল ভাষা হয়তো একটা আছে। দশ-বারো দিন আমার পক্ষে যত রকম ভাঙা আরবি সম্ভব তা দিয়ে কোনো রকম কমিউনিকেট করা আর কি, আর খুব বিপদে বা সমস্যায় পড়লে ছবি-টবি একে পরস্পরকে বোঝাতে চেয়েছি। আমি তার কাছে ইথিওপিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। তিনি আমাকে তার দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা যতটুকু বলা সম্ভব বলেছেন। আমার যা স্বভাব সে মোতাবেক তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছি, যে আপনারা এই করেন সেই করেন ইত্যাদি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রথম রাতেই একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়। আমরা ছিলাম মূল এয়ার কন্ডিশনের পাশে। সেখান থেকে সবখানে শীতল হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদেরকে কম্বল দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ডান পায়ের রগে টান লেগে যায়। ফলে আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। তীব্র ব্যাথা হচ্ছিল। পরদিন সকালে সবার সাথে আমাকেও তাওয়াফ করতে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে করব? হজ্বের জন্য মক্কায় পৌঁছে প্রথম কাজ হলো তাওয়াফ করা। কাজেই আমাকে তাওয়াফ করতেই হবে। কিন্তু আমি কাউকেই আর কিছু বললাম না। ফজরের পর আমি সাঈদী সাহেবের সাথে আলাপ করলাম। এখানে একথা বলে রাখা দরকার, আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তার নিচের তালাতেই নামাযের ব্যবস্থা ছিল। একসাথে প্রায় তিনশ লোক নামাজ পড়তে পারে। আমরা যে রুমে থাকতাম সেখানে সেরকম আরো ত্রিশ-চল্লিশটার মতো রুম আছে। সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকেরা তাতে আছে। নামাজের আগে ইমাম নিজেই আজান দেন, নিজেই একামত দেন, নিজেই ইমামতি করেন। আমাদের দেশে এটা হয় না। তবে বোঝা গেল অন্যান্য ফিকাহয় এটাও বৈধ। সেখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্যণীয় ছিল যে, সেখানে নারী-পুরুষ একই সঙ্গে নামাজ আদায় করছে। যেটা আমাদের দেশে হয় না। আমাদের সাথেই প্রায় শ'খানেক নারী সেখানে নামাজ পড়ল। জাস্টিস আবদুর রহমান সাহেবের মতো অনেক হাজীই স্বস্ত্রীক গেছেন। মেয়েদের জন্য কয়েক কাতার রেখে বাকিটা পুরুষের জন্য ব্যবস্থা করা আছে। হজ্ব তখনও শুরু হয়নি। হজ্বের প্রকৃত শুরু মিনা থেকে। সেটা শুরু হয় জ্বিলহজ্ব মাসের নয় তারিখে। আর আমরা সেখানে পৌঁছেছি তার তিন চার দিন আগে।

মিনা রেস্ট হাউসটা সুন্দর। খাওয়া-দাওয়াও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। যারা সেখানে রান্নাবান্না ও খাওয়ানোর দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকে মিসরীয় বলে মনে হলো। তারা ইংরেজদের মতোই সাদা বলে মনে হলো। তাদের অন্তত একটা অংশ খুবই ফর্সা হয়। খাবার দাবার ভালো ছিল। ব্যবস্থাপনাও ছিল ভালো।

আমার পায়ের কথা শুনে সাঈদী সাহেব একটু বিচলিত হলেন। বললেন, এতো বিপদের ব্যাপার দেখছি। তবে আল্লাহ যা করেন, আশা করি কিছু হবে না। সমস্যা হলে আপনাকে আমি খাটের উপর করে তাওয়াফ করার ব্যবস্থা করব। সেখানে খুব বেশি খারাপ অবস্থা কারোর হলে তাকে একটা বাহনে করে চারজনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাওয়াফ করিয়ে থাকে। তাতে তিন'শ রিয়াল লাগে। কিন্তু আমার কাছে তো কোনো রিয়ালই নাই। সামান্য কিছু বাদে অতিরিক্ত কিছু ছিল না। মনে পড়ে, আমি আসার আগে এর বেশি নয় ২/৩টি রুমাল ও স্কার্ফ কিনতে চাচ্ছিলাম। এর বেশি নয়। কারণ অধিক সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সাঈদী সাহেব নিজে আমাকে ৫/৭টি কিনে দিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বছর চারেক আগে তিনি এক তাফসীর মাহফিলে বলেছিলেন, আমাদের দেশে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এমন লোকও আছেন যাদের কিছু সামান্য জিনিস কিনে দেয়ার জন্যে অর্থ সাহায্য দিতে হয়। এই কথাটি ক্যাসেটের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, সাঈদী সাহেব সেই কথাটি এখনো মনে রেখেছেন।

কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি সাঈদী সাহেব বললেন, আসেন আমরা চেষ্ঠা করি। আমরা গেলাম। ব্যাপারটা সাঈদী সাহেব ছাড়া আর কেউ জানে না। তখন খুব ভীড়, তাওয়াফে একটা কোণা থেকে শুরু করে সেখানেই শেষ করতে হয়। সাতবার ঘুরতে হয় কাবাকে কেন্দ্র করে। ভয়ে ভয়ে তাওয়াফের জন্য নেমে পড়লাম। শুনেছি পদতলে পিষ্ট হয়ে মানুষ মারা যায়। পায়ের অবস্থাও ঠিক হয়নি। সেই ভয় যুক্ত হয়েছে। আমার এমনিই আমার ভিড়কে ভয় পাওয়ার স্বভাব আছে। সাঈদী সাহেব তার সামনে আমাকে নিয়েই তার সম্পূর্ণ নজরদারীতে তাওয়াফ করালেন। নিজের তাওয়াফ নিয়ে চিন্তা না করে আমি যাতে তাওয়াফ করতে পারি সেদিকে খেয়াল রাখতেন। তিনি প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

তওয়াফ করেই সাফামারওয়ার মধ্যে সাতবার ঘুরতে হয়। একে সায়ী বলে। সেখানেও একই ভিড়। সাঈদী সাহেব খুব সিরিয়াস প্রোটেকশন দিয়ে দিয়ে আমাকে এটা করালেন। আমাদের চোখের সামনে আমরা কোনো দুর্ঘটনা দেখিনি। যদিও কালো পাথর স্পর্শের জন্য একদল লোক খুব হুড়োহুড়ি করে। কিন্তু আমরা তার ধারের কাছেও যাবার চেষ্টা করিনি। এটা কিছু লোক খুব বেশি করে। কিন্তু এটা করার প্রয়োজন নেই। এর কোনো অর্থও নেই। তওয়াফ ও সায়ী করার পর আমার মনে হলো হজ্বে আমি দেখলাম চল্লিশভাগ নারী। অসংখ্য নারী আসে তুর্কী, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে। এর তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, আমি দেখলাম, নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। পুরুষদের জন্য নারীদেরকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে সেরকম তারা করেও না। সেখানে সবাই মোটামুটি একত্রিত হয়ে যায়। সেখানে নারীদের স্থান খুবই উঁচে। কোনো প্রকার পার্থক্য নেই হজ্বে। নামাজে অবশ্য পুরুষ থেকে আলাদা গ্রুপ করে নেয়। কাবার মধ্যে মহিলা পুরষ আলাদা আলাদা গ্রুপে নামাজ হয়। আর সেখানে লক্ষ লক্ষ নারীকে আলাদা করাও কষ্টসাধ্য। তাই নারীর স্বাধীনতা, নারী সম-অধিকার যেটা আমি হজ্বে দেখলাম তা আর কোথাও দেখলাম না। তারও কাবার অধিকার সমান এবং একই। এতে কোনো পার্থক্য নেই। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হজ্ব ইসলামের একটি পিলার। এখানে বিশ্বব্যাপী যে সংযোগ হবে তার স্থান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একদম সমান।

সায়ী করতে গিয়ে আমার যে কথা মনে হলো তা হলো আমি কেন সায়ী করছি? এই হাঁটা বা দৌড়ানোই বা কেন? এই সায়ীটা কি? আসলে এটা হলো, হযরত ইসমাইল (আ) ও হযরত হাজেরাকে রেখে হযরত ইবরাহীম (আ) যখন চলে গেলেন তখন হাজেরা (রা) পানি পাচ্ছিলেন না, সেই পানির খোঁজে তিনি দৌড়াদৌড়ি করছিলেন সাফামারওয়ার মধ্যে, তারই ঘটনা। আমরা জানি যে, সেখানে জমজম কূপ হয়ে গেল। হযরত হাজেরা (রা) যে পথে দৌড়েছিলেন সেই পথে সকল হাজীকে দৌড়ানোটাই হলো সায়ী। তার মানেও আমাদেরকে বুঝতে হবে। হযরত হাজেরা বা মা-এর তার সন্তানের জন্য এই দৌড়ানো আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় হয়েছিল যে তিনি এটাকে হজ্বের অংশ করে দিয়েছেন। এটা একটা দিক। দ্বিতীয়ত, তিনি চিরতরে মানুষকে বাধ্য করে দিয়েছেন যে হাজেরা যে পথে দৌড়েছিলেন সকল নারী-পুরুষকে সেই পথে দৌড়াতে হবে। তার মানে অন্যভাবে বলা যায়, এই নারীর পিছনে সকল মানবতা দৌড়াচ্ছে। এখানে দুনিয়ার সকল রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরা, গরীব-ফকির সকলে অর্থাৎ আমরা সবাই দৌড়াচ্ছি তার পিছনে। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিষয়। আমারও মনে হলো, আমি হাজেরার নেতৃত্বে তাকে অনুসরণ করেই দৌড়াচ্ছি। এই সায়ী প্রমাণ কওে, নারীর আমলকে আল্লাহতায়ালা কি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায়, আরাফাত থেকে মক্কা পর্যন্ত যে আসা যাওয়া সেটাকে ঐতিহাসিকভাবে বলা হয়ে থাকে, হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) দু'জন এই পথে এসেছিলেন। অর্থাৎ মক্কা থেকে আরাফার যে পথ তাতেও নারী ও পুরুষের উভয়ের অবদানই সমান। এইগুলো থেকে মনে হয় হজ্ব এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে নারীর গুরুত্ব অনেক উর্ধ্বে।

যাই হোক, আমরা হজ্ব করলাম। হজ্বের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সৌদি সরকার ভালোভাবেই করেছে। সব ধরনের সুবিধা সেখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মনে হলো, আমরা যখন মিনা থেকে আরাফাতে গেলাম, ৯ই জ্বিলহজ্ব সেখানে অবস্থান করে আমরা যখন মুজদালিফায় ফিরে আসলাম সন্ধ্যার পর, সেখানে আমি দেখলাম, একটা বিরাট মাঠে প্রায় বিশ লক্ষ লোক অবস্থান করছে। কিন্তু টয়লেট সুবিধা খুব সীমিত। আমার মনে আছে আমাকে টয়লেটের জন্য প্রায় দুই মাইলের মতো হাঁটতে হয়েছিল। এই অবস্থার ফলে নারী-পুরুষের খুব অসুবিধা হয়। এই বিষয়টি সৌদি সরকারে নজরে দেয়া উচিত। সে যুগে ছিল না বলে এখন থাকবে না এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। কেন তারা এটা করছেন না আমি তা বুঝতে পারি না। এ প্রসঙ্গে একথাও বলব যে, আমি যখন এই কথাটি তৎকালীন রাবেতার সেক্রেটারি জেনারেলকে বলেছিলাম তিনি তাতে ঠিক সন্তুষ্ট হননি। এটা আমাকে খুব অবাক করেছিল। তারা তাদের কোনো ত্রুটি শুনতে প্রস্তুত হন না। সব সৌদিই যে এমন তাও বলা যাবে না। রাবেতার সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে হজ্বের পর দেখা করি। তিনি আমাদেরকে কেমন হলো জিজ্ঞাসা করলে আমরা যা বলার বললাম। কিন্তু ভালো বলার পর আমি যখন এই বিষয়টা উল্লেখ করলাম তার চেহারায়, কপালে বিরক্তির ভাঁজ দেখলাম। এটা আমি নিজেও পছন্দ করিনি যে, যদি উন্নয়ন চায় তাহলে কেন তারা শুনবে না?

হজ্বে পাথর মারা হয়। শয়তানকে পাথর মারা মানে হলো নিজের শয়তানকে পাথর মারা। এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার। যদিও এই প্রতীকী বিষয়টি হজ্বের একটা আবশ্যক অঙ্গ। এখানেও আমি খুব ভালো ব্যবস্থাপনা দেখলাম না। সেখানে ওভারব্রিজ আছে। ব্রিজের উপর নিচ উভয় জায়গা থেকে পাথর মারা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, যদি যাওয়া আর আসার ব্যবস্থা আলাদা করে দেয়া হয় তাহলে সেখানে দুর্ঘটনা অনেক কমে যায়। এখানে বিভিন্ন সময় বহু হাজী মারা যায় শুধুমাত্র পদতলে পিষ্ট হয়ে। কিন্তু যদি সিস্টেমেটিক রাস্তা করে দেয়া যেত যে, একদিক দিয়ে যাবে আর একদিক দিয়ে আসবে শুধু তাহলে সমস্যা কমে যেত। এটা কেন তাদের মাথায় ঢোকে না তা আমার বুঝে আসে না। এখন কেমন হয়েছে জানি না তবে আমার সময় আমি খুব বিরক্ত হয়েছি। তারা বলতে পারে যে তারা এত কিছু করেছি। তাই যদি হয় তাহলে এতকিছুই যখন করেছেন এটা করবেন না কেন? আল্লাহর তরফ থেকে এতবড় একটা দায়িত্ব আপনারা পেয়েছেন তা আপনাদেরকে পালন করতেই হবে।

যাই হোক, আমরাও পাথর মারব। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি এই ভিড়ের মধ্যে কি করে পাথর মারব। আমার জন্য অন্যান্যরা ঠিক করলেন যে পাথর মারতে বিকালে যাবেন। তখন ভীড় কমে আসবে। কিন্তু আমরা যখন গেলাম তখনও অনেক ভীড়। তাই ঠিক হলো যে আমাদের লাইনে সামনে দাঁড়াবেন খতীব সাহেব, উনার বিরাট শরীর। মধ্যে ছোট আমি, সেখানে সামনে উনার মতো পাহাড়ের প্রাচীর থাকবে। আর পিছনে সাঈদী সাহেবের বিরাট শরীর। এই দুই জনের মাঝখানে নিয়ে তারা আমাকে পাথর মারালেন। পাথর তিন দিন মারতে হয়। সেই তিন দিন আমরা এভাবেই গেলাম। খতীব সাহেবের আমার প্রতি এই যে বিরাট অনুগ্রহ আর সাঈদী সাহেবের ভালোবাসা তা আমি ভুলতে পারব না। সাঈদী সাহেবের কাজই ছিল শুধু আমাকে দেখা - আমার যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। সাঈদী সাহেবকে মানুষ ভালোই জানেন। কিন্তু আমি দেখেছি, তিনি যাকে ভালোবাসেন তিনি তার কত খেদমত করেন। আমার একথাও বলা উচিত যে, হজ্বের সময় আমার কাপড়-চোপড় পর্যন্ত তিনিই জোর করে ধুয়ে দিয়েছেন। আমাকে কোনোকিছু ধুতে দেননি। এটাকেও তার মহৎ গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। আল্লাহতায়ালা তাকে অনেক পুরস্কার দান করুন এই দোয়াই করব।

একই বছর ড. আবদুল হামিদ হজ্বে যান। তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন এবং পরবর্তীতে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ভিসি থাকাবস্থায় বছর কয়েক আগে (১৯৯৯ সনে) ক্যান্সারে আমেরিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আমি মনে করি, তিনি ইসলামের এক মহৎ সন্তান এবং বড় অর্থনীতিবীদ ছিলেন। তিনি আমার থেকে একটু ছোট ছিলেন। তার কাছে আমাদের অনেক কিছু আশা ছিল। তিনি আমাদের মিনা রেস্ট হাউজের অন্যরুমে থাকতেন। সেখানে আমাদের মধ্যে নানা ধরনের আলোচনা হয়। বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা সহ এখনকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে আরো ভালো করা যায় সেসব পরিকল্পনা করি। সেই সাথে দেশের এবং ইসলামের জন্য কি করতে পারি কিভাবে অগ্রসর হতে পারি সেসব বিষয়ে আলোচনা করি।

ড. হামিদের সাথে এই দিক থেকে আমি ঐতিহাসিকভাবে জড়িত যে তার ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার পিছনে আমার একটা ভূমিকা ছিল। কারণ সরকার একজন ভিসি খুঁজছিলেন। একটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নাম দেওয়ার জন্য। তার প্রধান আবার আমার বন্ধু হওয়ায় তিনি আমার কাছে নাম চাওয়ায় আমি তাকে ড. আবদুল হামিদ এবং ড. মুস্তাফিজের নাম দিয়েছিলাম। আশ্চর্যের কথা যে, তখন তিনি ভিসি হলেন আর পরে ড. মুস্তাফিজ হয়েছেন। এটা একটা উল্লেখ করার মতো দিক। পরবর্তীতে যখন দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি নাম চাইল তখন আবার ড. হামিদের নাম দেই এবং তিনি ভিসি নিযুক্ত হন। আজকে তিনি দুনিয়াতে নেই। তার নিজের যোগ্যতার কারণেই আমি তার নাম দিয়েছিলাম।

হজ্বের সময় বিভিন্ন দেশের লোকজনের সাথে আমি আলাদা আলাদাভাবে বসেছি। তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি। যেমন এমএনএলএফ (MNLF) যেটা ফিলিপাইনের মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট - এর নেতৃবৃন্দ যে দু'একজন এসেছিলেন তাদের সাথে আমার আলাপ হয়। তাদের পরিস্থিতি শুনি। তাদেরকে আমি উপদেশ দেই। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লোকদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলি। তাদেরকে আমি যে সমস্ত কথা বলেছিলাম আমার মনে পড়ে তার মধ্য একটা ছিল শিক্ষার উপর। আমি শিক্ষার উপর, বিশেষ করে নারীদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে বলেছিলাম। আধুনিক ও ইসলামিক উভয় শিক্ষার উপরই গুরুত্বের কথা বলেছিলাম। মনে পড়ে, নাইজেরিয়ানদেরকে বলেছিলাম পশ্চিম আফ্রিকার ইসলামের নেতৃত্ব তাদেরকে দিতে হবে। তানজানিয়ানদেরকে বলেছিলাম পূর্ব আফ্রিকার দিকে নজর দিতে। অর্থাৎ তাদেরকেও নেতৃত্ব দেবার কথা বলেছিলাম। মানে আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাকে যে পরামর্শ দেবার দরকার তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছি। সবাই দেখত আমি ঘুরে ঘুরে এগুলো করছি। ফলে সেখানে সবার আমি ইনডাইরেক্ট নেতা হয়ে যাই। তারাও আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

বম্বের ডা. নায়েক নামে একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তিনি বম্বের অন্যতম প্রধান একজন মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। তার দুই ছেলে একজন জাকির নায়েক অন্যজনের নাম ভুলে গেছি। তাদের একজন ডাক্তার ও একজন ইঞ্জিনিয়ার। এই তিনজনের সাথে আমার পরিচয় ও আলাপ হয়। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, দুই ছেলেই ইসলামের অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী। ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েক ইসলামিক ব্যক্তিত্ব হয়ে গেছেন। তিনি একজন ডিবেটর, দক্ষিণ আফ্রিকার আহমদ দিদাতের মতো। যদিও আমি ডিবেটকে ইসলামের জন্য খুব ভালো পদ্ধতি বলে মনে করি না। ডিবেটের মাধ্যমে সব সময় সব কল্যাণ হয় না। তবে হতে পারে কিছু কল্যাণ হয়। ডা. জাকির নায়েক ভালো বক্তা। বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। তার বেশ কিছু ক্যাসেট আছে। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান ও একটি ওয়েবসাইট গড়ে তুলেছেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। যখন ১৯৯২ সালে প্রথম দেখা হয় তখন তাদের বয়স ছিল পঁচিশের মতো। তাদের মাধ্যমে আমি একটা জিনিস প্রথম পেলাম। ড. জামাল বাদাবীর লেকচার বুক। এর আগে ড. বাদাবীর ক্যাসেটগুলোই আমি আমার উইটনেস এবং পাইওনিয়র -এর ক্লাসে ব্যবহার করছিলাম। কিন্তু নায়েকই প্রথম জানালো এগুলো ইংরেজিতে বই আকারে বেরিয়ে গেছে এবং দেশে গিয়েই তা আমার জন্য পাঠিয়ে দিবে। দেশে ফিরেই সে আমাকে বইগুলো পাঠিয়ে দেয়। তারই বাংলা অনুবাদ ভলিউম ১, ২, ৩ আলাদাভাবে এবং তিন খণ্ডে একত্রে বেরিয়েছে।

যাইহোক, আমি হজ্ব শেষ করে দেশে ফিরে আসলাম। দেশে আসলাম প্যান্ট-সার্ট পড়ে। সে সময় এয়ারপোর্টে কাস্টমসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন জনাব ফকির আশরাফ। তার কয়েকটি বই আছে। এখন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রেস সেক্রেটারিও ছিলেন। তার স্ত্রী এমপি ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে বললেন, স্যার আমি অবাক হলাম আপনি প্যান্ট-সার্ট পড়ে হজ্ব থেকে ফিরেছেন অথচ হাজি মানেই হলো লম্বাকোর্তা। উত্তরে বললাম, আমি বেঠিক কিছু করিনি। সুন্দর এবং সতর ঢাকে এমন সব পোষাকই ইসলামিক পোষাক। লম্বাকোর্তা পড়ে হজ্ব থেকে ফিরে আসা আর এই পোশাকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই আমি মনে করি, এটা পড়ে ফিরে আসা ভালোই হয়েছিল। যা করতে হবে তা করতে হবে, আর যা করতে হবে না তা করতে হবে না।

যাইহোক, হজ্ব আমার জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। খতীব সাহেব ও সাঈদী সাহেবকে আমার খুব গভীরভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। ডা. হামিদ সহ বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে দেখার ও বোঝার সুযোগ হয়েছে। সৌদি সোসাইটিকে দেখার সুযোগ হয়েছে। যেগুলো পরবর্তীতে আমার ইসলামিক কাজে ব্যবহার করতে সুবিধা হয়েছে।

উইটনেস- পাইওনিয়ার

আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি কাজ হচ্ছে উইটনেস নামে একটি সংগঠন করা। পরবর্তীকালে পাইওনিয়ার নামে আরেকটি সংগঠন করা এবং তারপরে এ দু'য়ের সমন্বয়ে উইটনেস-পাইওনিয়ার নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তৈরি হওয়া।

এর পটভূমি হচ্ছে, সত্তরের দিকে আমি বুঝতে পারছিলাম বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করছিল। আমি লক্ষ্য করছিলাম ইসলাম সম্পর্কে নারীদের মনে অনেক প্রশ্ন আছে। আল্লাহর অস্তিত্ব বা তৌহিদ নিয়ে তাদের মধ্যে যে কোনো মৌল বিষয়ে প্রশ্ন ছিল তা নয়। আখেরাত, রিসালাত নিয়ে বা রাসূল নিয়ে তাও নয়। কিন্তু তাদের মনের যেসব প্রশ্ন ছিল তা প্রধানত তাদের অধিকার সংক্রান্ত। সম্পত্তির অধিকার, বহুবিবাহ সহ তখন পর্যন্ত মেয়েদের কর্মসংস্থানে এরকম বাঁধা ছিল যে, প্রয়োজন হলেও কেন তারা শ্রমিকের কাজ করতে পারবে না? অফিস আদালতে তাদের প্রতিনিধিত্বের হার কম কেন? অথচ তাদের কাজের দরকার। ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন ছিল। পর্দা বা হিজাবের বিষয়েও তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। তাদের শিক্ষার সম্পর্কে একটা অস্পষ্টতা ছিল। রাজনৈতিক অধিকার বিষয়েও অস্পষ্টতা ছিল। কেন তাদের মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হয়? কিংবা কেন তাদের কবরস্থানে যেতে দিতে বাধা দেয়া হয়? কিছু লোক বলে মেয়েরা পার্লামেন্টে যেতে পারবে, না মন্ত্রী হতে পারবে না। কেউ কেউ বলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না বা তাদের রাজনৈতিক অধিকার কতটুকু এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন তাদের ছিল।

এসব কারণে নারীদের মধ্যে যথেষ্ট ভুল বুঝাবুঝি ছিল। তখন পর্যন্ত আমাদের দেশে ইসলামী আন্দোলনের মেইন স্ট্রিমে নারীদের উপস্থিতি ছিল অনেক কম। সেই সময় ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামের কাজ অনেক কম ছিল। যদি গোটা ছাত্র সমাজের মধ্যে ১০-১৫% হয় ছাত্রীর হার, সেখানে ১-২% বা তার চেয়েও কম জড়িত ছিল তারা ইসলামের কাজে। এরকম ব্যাপক হারগত পার্থক্য রয়েছে। আমি আরো লক্ষ্য করেছি, এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে থেকে কিছু না কিছু পুরুষ লেখক, স্কলার বেরিয়েছে যারা আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জকে বুঝতে ও মোকাবিলা করতে যেভাবে অগ্রসর হওয়ার দরকার হতে পারে। কিন্তু নারীদের মধ্যে তেমন কোনো লোক তৈরি হচ্ছে না। হলেও খুবই কম হচ্ছে।

এ সার্বিক বিবেচনায় আমি প্রথমত মনে করলাম, মেয়েদের মধ্যে একদল অগ্রসর ধার্মিক গ্রুপ তৈরি করা প্রয়োজন। আর সেটা শুরু করতে হবে তাদের মধ্যে যাদের বয়স এখনও অল্প। যাদের মন-মানসিকতা এখনও গঠিত হয়নি যারা বিভিন্ন আইডিয়া ধারণ করতে পারবে। যারা নতুন চিন্তাধারা ধারণ করতে পারবে। এই নতুন চিন্তাধারা হলো ইসলামের ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তাধারা, নতুন উপলব্ধি, নতুন বক্তব্য। সেগুলো তারা বুঝতে পারবে। এ রকম পরিস্থিতিতে মেয়েদের মধ্যে আমি একদল অগ্রসর লোক তৈরির কথা উপলব্ধি করলাম যারা ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে যে গবেষণা হচ্ছে তা আত্মস্থ করতে পারবে।

সেটা করার জন্য আমি মনে করলাম, তরুনীদের মধ্যে কাজ করতে হবে। আল্লাহতায়ালাই তখন আমাকে সুযোগ করে দিলেন। কিছু মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তখন আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য। সেসব মেয়েদের নিয়ে আমি আমার বাসায় একটা ক্লাস শুরু করলাম। এই ক্লাসেরও একটা ব্যাক গ্রাউন্ড ছিল। কিছু মহিলা এবং মেয়ে একত্র হতো জাস্টিস আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী সাহেবের বাসায়। সেটা ছিল মিন্টু রোডে। সেটা ছিল উইটনেসের বর্তমান সভানেত্রী নাসিমা হাসানদের বাসা। কিছু দিন পর আমি উপলব্ধি করলাম বয়স্ক মহিলাদের ততটা প্রভাবিত করা যাবে না বা ততটা দ্রুত গড়ে তোলা যাবে না। ফলে যদি তরুনী মেয়েদের আলাদা করে ক্লাস নিতে পারি তাহলে সেটা ভালো হবে। ফলে আমি আলাদা করে তাদেরকে একত্র করলাম এবং আমার বাসায় সে ক্লাসটা শুরু করলাম। সেই ক্লাসের প্রথম দিককার ছাত্রীদের মধ্যে ছিল জাস্টিস আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী সাহেবের পুত্রবধু নাসিমা হাসান, বুয়েটের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দা রাজিয়া সুলতানা, ডাঃ মীরা মমতাজ সাবেকা, সাবেক জাস্টিস মোস্তফা কামালের মেয়ে নাজিফা কামাল সহ আরো ১০/১২ জন। এ সময়ের একটু আগে পরে নাজমুন নাহার, আলিফ রুদাবা সহ আরো কয়েকজন একত্রিত হলো। তাতে ব্যারিস্টার কোরবান আলী সাহেবের মেয়ে ছিল। এদের নিয়েই উইটনেসের প্রথম দিককার ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস বিভিন্ন সময় বিভিন্নখানে হতো। আমার বাসায় হয়েছে। পরে নাসিমা হাসানের বাসায়

হয়। সেখান থেকে আবার বিভিন্ন জায়গায় সিফট করেছি। বর্তমানে তা ধানমন্ডির ২ নম্বর রোড়ের ২৪ নং বাড়িতে ফেরদৌস খান সাহেবের বাসায় হচ্ছে।

আশির অবস্থাকে সামনে রেখে আমি এই কাজ শুরু করি। আমার এটাই লক্ষ্য ছিল যে আমি কিছু মেধাবী মেয়ে তৈরি করব। যারা প্রথমে এসেছিল তারা মেডিকেল, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল। এরা ছাত্রী হিসেবে প্রায় সবাই মেধাবী ছিল। তাদের বোঝার ক্যাপাসিটি ভালো ছিল। উইটনেসের ক্লাস আমি ড. জামাল বাদাবীর Islamic Teaching Course এর ২০০ লেকচার সিরিজ দিয়ে শুরু করলাম। তখনও তার এই লেকচার সিরিজের বই বের হয়নি। কিন্তু আমি তার অডিও ক্যাসেটগুলো পেয়েছিলাম। সেগুলোকে আমি রাতে শুনতাম, হাতে নোট করে পরের দিন পর পর একেকটা করে লেকচার আমি দিতাম। তার ক্যাসেটের জি-সিরিজ আমি প্রথমে ব্যবহার করি। জি-সিরিজে Social System of Islam নামক বক্তব্য ছিল। প্রায় ৪৬টি বক্তৃতা আমি ৪৬টি পাক্ষিক ক্লাসে ব্যবহার করি। এতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। এরপর সেই ক্যাসেটের A, B, C যাতে ঈমানের উপর আলোচনা আছে সেগুলো ব্যবহার করি। সেটাও দুই বছর ধরেই চলতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে তারা উন্নতির দিকে আগাতে থাকে। সেসব ক্লাসগুলোতে প্রায় ১০ থেকে ৩০ জন ছাত্রী উপস্থিত হতো।

এরপর তাদের ক্লাসগুলোতে নূরুল আনোয়ারকে ভিত্তি করে উসূল পড়াই। আরো অনেক পরে গিয়ে হাশিম কামালীর Islamic Jurisprudence এর উপর ভিত্তি করে উসূল পড়াই। সেই সাথে ইসলামিক ল' আমি তাদের পড়াই। এটার ভিত্তি করি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বিধিবদ্ধ 'ইসলামিক আইন' বইটি। মাওলানা মওদূদীর রাসায়েল ও মাসায়েল থেকে আজকের জন্য যেসব বেশি প্রয়োজন সেসব বিষয়ে আলোচনা করি। এই ক্লাসে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর ইসলামের হালাল-হারামের বিধান, ইসলামী পূর্ণজাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা, প্রাওরিটিস ও ইসলামিক মুভমেন্ট ইন দ্যা কামিং ফেস বইটি পড়িয়েছি। তাদের ক্লাসে বিভিন্ন বই ভিত্তিক আলোচনা করেছি। আরো পড়ে ড. আবদুল হামিদ আবু সুলেমানের দি ক্রাইসিস অব দি মুসলিম মাইন্ড, ইসলামিক থিওরি অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বইও আমি পড়িয়েছি। থিওরি অব ইন্টারন্যাশনল রিলেশন বইতে ভবিষ্যতে আন্তজাতিক সম্পর্ক কি হবে, আন্তঃদেশ সম্পর্ক কি হবে - এসব বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা আছে। ক্রাইসিস ইন দ্যা মুসলিম মাইন্ড বইতে ইসলামের একটা মেনিফেস্টো আছে যে ভবিষ্যতে আমাদের কি করতে হবে এবং আমাদের ক্রাইসিসটা কি হয়েছে এবং এর উত্তরণটা কিভাবে হবে?

এইভাবে ১৯৮৯ সাল থেকে ছাত্রীদের আমি ক্লাস নিচ্ছি। প্রত্যেক ক্লাসেই আবার প্রশ্ন উত্তর থাকত। এ পদ্ধতিতে আমি তাদেরকে তৈরি করা শুরু করি। এই সব মেয়েরা কেউ মাস্টার্স করেছে, কেউ পিএইচডি করেছে এবং কেউ করছে। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছে। তাদের অনেকে লেখিকা হয়েছে, অনেকে বক্তা হয়েছে। কেউ কেউ টিভি প্রোগ্রামগুলোতে পারফর্ম করে। এভাবে একটা গ্রুপ তৈরি হয়।

উইটনেস শুরুতে উইটনেস নামে ছিল না। শুরুতে ক্লাস মাত্র ছিল। কিন্তু বছর খানিক পরে মনে করা হলো এর নামকরণ করা দরকার। তখন সেই ক্লাসেরই এক ছাত্রী তাহমিনা উইটনেস নামটি প্রস্তাব করে। উইটনেস হচ্ছে 'আশশাহাদাহ' - কোরআনে যেটাকে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। সেই শব্দ থেকে এটাকে নেয়া হয়েছে। এই নামকরণের আরো ৭/৮ বছর পরে তার সংবিধান তৈরি করা হয়। সেই ভিত্তিতে এটা আজ একটি ছোট্ট ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

উইটনেস সংগঠন শুরু করার বছর খানিক পরই আমি মনে করলাম, ছেলেদের মধ্যেও একই উদ্দেশ্যে একদল ইন্টেলেকচুয়াল স্কলার তৈরি করা দরকার। যেটা আমার ধারণা মতে বাংলাদেশে হচ্ছিল না। এ ধারণা ভুলও হতে পারে। বাংলাদেশে সিরিয়াস স্কলার তৈরির প্রচেষ্টার অভাব অনুভব করায় আমি মনে করলাম এ কাজটাও আমি হাতে নিতে পারি। ফলে আমি আমার ছেলে শাহ মোস্তফা ফয়সাল, তার যে হাউস টিউটর ছিল তুষার এবং তার কয়েকজন বন্ধু হাসান শহীদ, শহীদুল ইসলাম প্রসানিক, আবুদল মজিদ প্রমুখদেরকে নিয়ে পাইওনিয়ার নামে ছেলেদের সংগঠনের ক্লাস শুরু করি। ১৯৯০ সালে পাইনিয়রের শুরু হয়। এর সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। পাইওনিয়ারের জন্যও আমি দীর্ঘ ১৩/১৪ বছর ধরে উইটনেসের মতো প্রায় একই কোর্স ফলো করেছি। পার্থক্য হলো শুধু ক্লাসের ক্ষেত্রে, পাইওনিয়ারের প্রতি সপ্তাহে ক্লাস হয় আর উইটনেসে দু'সপ্তাহে একটি ক্লাস হয়।

উইটনেস-পাইওনিয়রের সামনে আমি আধুনিক বিশ্বের কারেন্ট ইস্যুগুলো নিয়ে আসি। আমরা এখানে কট্টরপন্থা ব এক্সট্রিমিজম ইস্যুকে সামনে আনি। এটা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোনো কল্যাণ করবে না। ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থা। মুসলিম বিশ্বের জন্য একটা সংকট হচ্ছে এক্সট্রিমিজম, সেটা ধার্মিক বা পলিটিক্যাল যেটাই হোক না কেন। তেমনিভাবে আমি মেয়েদের মর্যাদা দেয়ার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসি। তাদের যে মৌলিক মানবিকতা, তাদের যে ত্যাগ সেটাকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। তাদেরকে সমাজে, ইসলামিক কর্মকাণ্ডে একত্রে সমন্বিত করতে হবে। তাদের মর্যাদা দিতে হবে যাতে তারা ইসলামকে আপন মনে করতে পারে। এই জেন্ডার ইস্যুতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, আল্লামা জামাল আল বাদাবী, ড. হাসান তুরাবী, ড. আহমদ আবদুল আতি, তাহা জাবির আল আলওয়ালী প্রমুখ স্কলারদের আমরা ফলো করি। উসূলের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। কেননা উসূল সম্পর্কে না জানলে কোরআন-সুন্নাহ ভালো করে জানা যায় না। এর অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে। ভুল ব্যাখ্যা বাড়ে।

আমরা ক্লাসে ইসলামিক এডুকেশনের উপরে গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা একটা আধুনিক ইসলামিক এডুকেশন দরকার বলে মনে করি। তার জন্য আমরা মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির যে বৈশিষ্ট্য, সেখানে আধুনিক ও ইসলামিক শিক্ষার সমন্বয়, তাকে ভিত্তি করার কথা আমরা বলেছি। পলিটিকসের ক্ষেত্রে আমরা হিউম্যান রাইটসের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে গণতন্ত্রের কথা বলেছি। যে গণতন্ত্রকে মাওলানা মওদূদী, ড. কারযাভী সহ পাকিস্তানের শ্রেষ্ট আলেমগণ সমর্থন করেছেন। ইখওয়ান, জামায়াতের ইসলামী পাকিস্তানের এমএমএ যে গণতন্ত্রকে সমর্থন করছে সেই গণতন্ত্রকে আমাদের সমর্থন করতে হবে। বুঝতে হবে, ইসলামের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। শুধু মূল আইন হবে আল্লাহর - এই শর্ত সাপেক্ষে তা হতে হবে। সে গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার হতে হবে। এই কয়েকটি বিষয়েকে আমরা হাইলাইট করেছি।

পাইনিয়ারেরও একই ভাবে পরবর্তীতে নামকরণ করা হয়। এদের থেকে লেখক, স্কলার বেরিয়ে আসছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমার কিছু ছাত্র ১৯৯৬ সালের আগেই আমেরিকা চলে যায়। এদের মধ্যে আছে মঈনুল হক, সারা আহমদ, সিলভিয়া রহমান ববি, নাজমুন নাহার, ইমরান চৌধুরী প্রমুখ। এরা বাহিরে গেলেও তাদের সাথে আমার ইমেল ও টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। আমিই তাদেরকে বলি দেশে তোমরা উইটনেস-পাইওনিয়ারে ছিলে। বাহিরে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু তোমাদের একত্রে কাজ করতে হবে। যেহেতু সেখানে দুটি সংগঠন করা সম্ভব নয় তাই তোমাদেরকে একটি সংগঠন করতে হবে। কিন্তু তারা কেমনে করবে? তাই তাদেরকে বললাম, তারা বছরে একবার অন্তত একত্রিত হবার চেষ্টা করতে পারে। এদের পরে বাহিরে যায় সৈয়দা রাজিয়া সুলতানা। সে যাওয়ার পর আমার আবেদন একটি গতি পায়। তখন সবাই পরামর্শ করে ডব্লিউপি (WP : Witness-Poioneer) নামে একটি সংগঠন দাঁড় করায়। তারও একটি সংবিধান হয়। আবদুর রহমান বাকি বিল্লাহ নামে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এক টিচার সেখানে গিয়ে প্রথম সভাপতি হয়। আর সেক্রেটারি জেনারেল হয় ইমরান চৌধুরী। ডব্লিউপি নিজেরাই ঠিক করল তারা কি কি কাজ করবে। তারাও সেই একই ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। তারা একটি ছোট নিউক্লিয়াস হবে এবং বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী ছড়াবে। আমি তাদের এরিয়া স্পেশালিস্ট হতে বলি। অর্থাৎ তাদের কেউ আফ্রিকা, কেউ এশিয়া, কেউ ইউরোপ কিংবা কেউ আমেরিকার বিশেষজ্ঞ হবে। কিংবা তাদের কান্ট্রি স্পেলালিস্ট হতে হবে অর্থাৎ একেকটি দেশের উপর বিশেষজ্ঞ হবে। একই সাথে তাদের আবার সাবজেক্ট স্পেশালিস্টও হতে বলি। তারা এর কিছুটা কার্যকর করতে পেরেছে আর কিছুটা পারেনি। ইতোমধ্যে তারা ইন্টারনেটে একটি ওয়েব লাইব্রেরি স্থাপন করেছে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে ইসলামের উপর যেসব গুরুত্বপূর্ণ বই বের হচ্ছে তারা সেখানে তা রাখছে। যে কোনো ব্যক্তি তাদের ওয়েব সাইট www.witness-poioneer.org থেকে নিজেদের পছন্দ মতো ডকুমেন্ট ডাউন লোড করে নিতে পারবে। এরপর তারা একটা স্কুল করে ও তার মাধ্যমে তারা নানারকম কোর্স চালু করে। এর প্রথম কোর্স আমিই করালাম উসূল আল ফিকহের উপর। প্রায় ৩০/৪০ জন ছাত্র নিয়ে ইন্টারনেট এই কোর্স করা হয়। এদের মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, মিসর সহ মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রও ছিল। এই কোর্স ইন্টারনেট চ্যাটের (chat) মাধ্যমে করা হয়। সেই কোর্সের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে উসূল আল ফিকহের উপর আমার বইটি ৬ মাসে ১৪ টি লেকচারের মাধ্যমে শেষ করা হয়। এতে মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষার পদ্ধতিও ছিল। এর পরিচালনায় আমাকে দেশে সফিকুর রহমান ও বিদেশী হার্ভার্ডের ল' স্টুডেন্ট ওহিদুল ইসলাম দু'জনে সাহায্য করে। পরবর্তীতে আমি ইকোনোমিকসের উপরে আরেকটি কোর্স ডিজাইন করি।

উইটনেস পাইওনিয়ারে প্রায় সবাই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। আশা করা যায় তাদের মধ্যে বেশ কিছু ভালো স্কলার বেরিয়ে আসবে। লেখক বেরিয়ে আসবে। আমার ধারণা মতে বিভিন্ন দেশে নেতৃত্বে তারা থাকবে। দেশে ফিরে এসে নেত্বের পর্যায়ে যেতে পারবে। এটা ইসলামের কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করছে।

শেষের কথাঃ

আমার কাল এবং আমার চিন্তা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা বলার তা বলা হয়ে গেল। এটি প্রকাশিত হতে শুরু করার পর অনেকে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাদের অনেকেই অনুরোধ করেছেন আরো কিছু বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করতে। পরবর্তীতে আল্লাহ যদি সময় সুযোগ দেন, তাহলে সেসকল বিষয় নিয়ে আবার হাজির হবো ইনশা আল্লাহ।